

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ

লালবাগ দুর্গ

প্রথমে এই কেল্লার নাম ছিল কেল্লা আওরঙ্গবাদ। আর এই কেল্লার নকশা করেন শাহ আজম। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর ৩য় পুত্র আজম শাহ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সুবেদারের বাসস্থান হিসেবে এ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মাত্র এক বছর পরেই দুর্গের নির্মাণকাজ শেষ হবার আগেই মারাঠা বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে দিল্লি ডেকে পাঠান। এসময় একটি মসজিদ ও দরবার হল নির্মাণের পর দুর্গ নির্মাণের কাজ থেমে যায়। নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৮০ সালে ঢাকায় এসে পুনরায় দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তবে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর এ দুর্গ অপয়া মনে করা হয় এবং শায়েস্তা খান ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ বন্ধ করে দেন। এই পরী বিবির সাথে শাহজাদা আজম শাহের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পরী বিবিকে দরবার হল এবং মসজিদের ঠিক মাঝখানে সমাহিত করা হয়।

শায়েস্তা খাঁ দরবার হলে বসে রাজকাজ পরিচালনা করতেন। ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খাঁ অবসর নিয়ে আগ্রা চলে যাবার সময় দুর্গের মালিকানা উত্তরাধিকারীদের দান করে যান। শায়েস্তা খাঁ ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা কারণে লালবাগ দুর্গের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৮৪৪ সালে ঢাকা কমিটি নামে একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্গের উন্নয়ন কাজ শুরু করে। এ সময় দুর্গটি লালবাগ দুর্গ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১০ সালে লালবাগ দুর্গের প্রাচীর সংরক্ষিত স্থাপত্য হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে আনা হয়। অবশেষে নির্মাণের ৩০০ বছর পর গত শতকের আশির দশকে লালবাগ দুর্গের যথাসম্ভব সংস্কার করে এর আগের রূপ ফিরিয়ে আনা হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এখানকার স্থাপনার অন্তর্গতঃ পরীবিবির সমাধি বেশ উল্লেখযোগ্য। এটি মোগল আমল এর একটি চমৎকার নিদর্শন। প্রশস্ত এলাকা নিয়ে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। কেল্লার চত্বরে তিনটি স্থাপনা রয়েছে-

- কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মাম খানা
- পরীবিবির সমাধি
- উত্তর পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বাংশে সুদৃশ্য ফটক, এবং দক্ষিণ দেয়ালের ছাদের উপরে বাগান রয়েছে। বর্তমানে রবিবার পূর্ণ দিবস ও সোমবার অর্ধদিবস বন্ধ থাকে। সপ্তাহের বাকী ছয়দিন এই কেল্লা দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।



সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৫ নভেম্বর ২০১৪

মুঘল ঈদগাহ্

(ধানমন্ডি ঈদগাহ্)

ধানমন্ডির পুরোনো ১৫ এবং নতুন ৮/এ সড়কে অর্থাৎ সাতমসজিদ রোড এলাকায় প্রাচীরবেষ্টিত মাঠটি মুঘল ঈদগাহ্। এটি ধানমন্ডি ঈদগাহ্ নামে বহুল পরিচিত। এই ঈদগাহ্ প্রায় চারশ বছর আগে শাহ্ সুজার আমলে তাঁর দেওয়ান মীর আবুল কাসিম কর্তৃক নির্মিত। এই তথ্যটি ঈদগাহের কেন্দ্রীয় মেহরাবের শিলালিপি থেকে জানা যায়। প্রায় আড়াইশ ফুট দৈর্ঘ্য এবং দেড়শ ফুট প্রস্থে চুন-সুরকির প্রাচীর বেষ্টিত থাকলেও বর্তমানে কেবলমাত্র পশ্চিম দিকের মূল উঁচু দেয়ালটি দণ্ডায়মান। এই ঈদগাহটি ১৬৪০ সালে নির্মাণের পর থেকে ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিখ্যাত স্থপতি আবু সৈয়দ এম, আহমেদ লিখেছেন যে, মোঘল আমলে নির্মিত এই ঈদগাহের মতো স্থাপত্যকলার নিদর্শন আর একটিও নেই। এই ঈদগাহটি পর্যটকগণের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।



আহসান মঞ্জিল (গোলাপী প্রাসাদ)

আহসান মঞ্জিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কুমারটুলি এলাকায় ঢাকার নওয়াবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারির সদর কাচারি। বর্তমানে জাদুঘর।

কথিত আছে, মুঘল আমলে এখানে জামালপুর
পরগণার জমিদার শেখ এনায়েতউল্লাহ'র
রঙমহল ছিল এ স্থানটি। পরে তাঁর পুত্র
মতিউল্লাহ'র নিকট থেকে রঙমহলটি ফরাসিরা
ক্রয় করে এখানে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন
করে।

১৮৩০ সালে খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসিদের নিকট থেকে
কুঠিবাড়িটি কিনে নেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে
এটি নিজের বাসভবনে পরিণত করেন। এ বাসভবনকে কেন্দ্র
করে খাজা আব্দুল গণি মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানী নামক একটি
ইউরোপীয় নির্মাণ ও প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে একটি
মাস্টার প্ল্যান তৈরী করান যার প্রধান ইমারত ছিল আহসান
মঞ্জিল। ১৮৫৯ সালে আহসান মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে
১৮৭২ সালে সমাপ্ত হয়। আব্দুল গণি তাঁর পুত্র খাজা
আহসানউল্লাহ'র নামানুসারে ভবনের নামকরণ করেন আহসান
মঞ্জিল। ওই যুগে নবনির্মিত প্রাসাদ ভবনটি রঙমহল এবং
পূর্বেকার ভবনটি অন্দরমহল নামে পরিচিত ছিল।
আহসান মঞ্জিল দেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। ১
মিটার উঁচু বেদির উপর স্থাপিত দ্বিতল প্রাসাদ ভবনটির আয়তন

দৈর্ঘ্যে ১২৫.৪ বর্গমিটার ও প্রস্থে ২৮.৫ বর্গমিটার। নিচতলায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৫ মিটার ও দোতলায় ৫.৮ মিটার। প্রাসাদটির উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে একতলার সমান উঁচু করে গাড়ি বারান্দার উপর দিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে একটি সুবৃহৎ খোলা সিঁড়ি সন্মুখস্থ বাগান দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত নেমে গেছে। সিঁড়ির সামনে বাগানে একটি ফোয়ারা ছিল যা বর্তমানে নেই। প্রাসাদের উভয় তলার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দা ও কক্ষগুলির মেঝে মার্বেল পাথরে শোভিত।

আহসান মঞ্জিলের ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যিক গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার ভবনটিকে সংস্কার করে জাদুঘরে পরিণত করেছে। গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের দায়িত্বে এর সংস্কার কাজ ১৯৯২ সালে সম্পন্ন করে ওই বছরেরই ২০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রাসাদটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং এখানে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়।



মসিউর

সোনারগাঁও

বাংলার প্রাচীন রাজধানী

নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোগড়াপাড়া ক্রসিং থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উত্তরে সোনারগাঁও অবস্থিত। সবুজ বন-বনানী আর অনুপম স্থাপত্যশৈলীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নান্দনিক ও নৈসর্গিক পরিবেশে ঘেরা বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু আমলের রাজধানী এখানেই অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম থেকে সোনারগাঁও নামের উদ্ভব বলে কারো কারো ধারণা রয়েছে। অন্য ধারণামতে বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈশা খাঁ'র স্ত্রী সোনারবিবি'র নামানুসারে সোনারগাঁও নামকরণ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের মধ্যে শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনারগাঁও একটি গৌরবময় জনপদ।

আনুমানিক ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়। মধ্যযুগে এটি মুসলিম সুলতানদের রাজধানী ছিল। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সোনারগাঁও ছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। ঈশা খাঁ ও তাঁর বংশধরদের শাসনামলে সোনারগাঁও ছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। সোনারগাঁও-এর আরেকটি নাম ছিল পানাম। পানাম নগরের নির্মিত ভবনগুলো ছোট লাল ইট দ্বারা তৈরী। ইমারতগুলো কোথাও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার কোথাও সন্নিহিত। অধিকাংশ ভবনই আয়তাকার এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। দীর্ঘ একটি সড়কের উভয় পাশে দৃষ্টিনন্দন ভবন স্থাপত্যের মাধ্যমে পানামনগর গড়ে উঠেছিল। উভয় পাশে মোট ৫২টি পুরোনো বাড়ী এই ক্ষুদ্র নগরীর মূল আকর্ষণ। পানাম শহরের ঠাকুরবাড়ি ভবন ও ঈশা খাঁ'র তোরণকে একত্রে নিয়ে মোট প্রায় ষোল হেক্টর স্থান জুড়ে লোকশিল্প ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অবস্থান। এখানে ১টি জাদুঘর, ১টি লোকজ মঞ্চ, সেমিনার কক্ষ ও কারুশিল্প গ্রাম রয়েছে। এখানকার জাদুঘরে প্রায় সাড়ে চারহাজার নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। তবে শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জুমার নামাজের জন্য জাদুঘর বন্ধ থাকে।



উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত উয়ারী এবং বটেশ্বর গ্রাম দু'টি ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। গ্লাইসটোসিন যুগে গঠিত মধুপুর গড়ের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এ গ্রাম দু'টিতেই

নিবিড় অনুসন্ধান ও সীমিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উয়ারী প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয়েছে ৬০০ মি. x ৬০০ মি. আয়তনের চারটি মাটির দুর্গ-প্রাচীর। দুর্গ প্রাচীরের ৫-৭ ফুট উঁচু ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু অংশ এখনো টিকে আছে। এছাড়াও দুর্গের চারিদিকে রয়েছে পরিখা (যদিও কালের ব্যবধানে তাতে মাটি ভরাট হয়েছে)। ভরাট হলেও পূর্ব প্রান্তের পরিখার চিহ্ন এখনো দৃশ্যমান। দুর্গের পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৫.৮ কি.মি. দীর্ঘ, ২০মি. প্রশস্ত ও ১০ মি. উঁচু অসম রাজার গড় নামে একটি মাটির বাঁধ রয়েছে। সম্ভবত এটি দ্বিতীয় দুর্গ প্রাচীর হিসেবে উয়ারী দুর্গনগরের প্রতিরক্ষার কাজ করত। ভারতের নাগার্জুনকুন্ড হলো এরকম দ্বিত্বের বিশিষ্ট দুর্গ প্রাচীরের আরেকটি উদাহরণ।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত উয়ারী নগরের বাইরে আরো ৫০টি প্রত্নস্থান এ যাবত আবিষ্কৃত হয়েছে। বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মতো উন্নত পরিকল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মহাস্থান ও উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চলের বসতিবিন্যাসেও দেখা যায়। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি দুর্গনগর, নগর বা একটি নগর কেন্দ্র। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ

করলেও দেখা যায় যে, উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একাধারে একটি নগর ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। বহু প্রত্নতত্ত্বপ্রেমী পর্যটক উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বেড়ান।



ময়না

ময়নামতি

ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এয়াবৎ আবিষ্কৃত লালমাই অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হল ময়নামতি প্রত্নস্থল। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে

ধবংশস্তূপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী ও বৌদ্ধ বিহারের অবশিষ্টাংশ । প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইহা জয়কর্মান্তবসাক নামক একটি প্রাচীন নগরীর ধবংসাবশেষ ।

কুমিল্লার ময়নামতিতে খননকৃত সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম প্রধান।

কোটবাড়িতে বার্ডের কাছে লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান। বিহারটির আশপাশে এক সময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার। এর সন্নিহিত গ্রামটির নাম শালবনপুর। এখনো ছোট একটি বন আছে সেখানে। এ বিহারটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মতো হলেও আকারে ছোট।

ধারণা করা হয় যে খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। শালবন বিহারের ছয়টি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ পর্বের কথা জানা যায়। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় ও বিহারটির সার্বিক সংস্কার হয় বলে অনুমান করা হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের নির্মাণকাজ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয় নবম-দশম শতাব্দীতে।

আকারে এটি চৌকো। শালবন বিহারের প্রতিটি বাহু ১৬৭.৭ মিটার দীর্ঘ। বিহারের চার দিকের দেয়াল পাঁচ মিটার পুরু। কক্ষগুলো বিহারের চার দিকের বেষ্টনী দেয়াল পিঠ করে নির্মিত। বিহারে ঢোকা বা বের হওয়ার মাত্র একটাই পথ ছিল। এ পথ বা দরজাটি উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের মাঝে ১.৫ মিটার চওড়া দেয়াল রয়েছে। বিহার অঙ্গনের ঠিক মাঝে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দির।

বিহারের বাইরে প্রবেশ দ্বারের পাশে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি হলঘর রয়েছে। চার দিকের দেয়াল ও সামনে চারটি বিশাল গোলাকার স্তম্ভের ওপর নির্মিত সে হলঘরটি ভিক্ষুদের খাবার ঘর ছিল বলে ধারণা করা হয়। হলঘরের মাপ ১০ মিটার গুণন ২০ মিটার। হলঘরের চার দিকে ইটের চওড়া রাস্তা রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আটটি তাম্রলিপি, প্রায় ৪০০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অসংখ্য পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটা, সিলমোহর, ব্রৌঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে।

এ স্থানটি দর্শনে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমাগম ঘটে। ঢাকা থেকে ১১৪ কি.মি. দূরে ময়নামতির অবস্থান এবং চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ২ ঘন্টায় ময়নামতি পৌঁছানো সম্ভব।



পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার
বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ
বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব অষ্টম শতকের
শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি

করছিলেন। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুন্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থান) এবং অপর শহর কোটিবর্ষ (বর্তমান বানগড়)এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল সোমপুর মহাবিহার। এর ধ্বংসাবশেষটি বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহীর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। অপর দিকে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব পশ্চিমদিকে মাত্র ৫ কিমি। এর ভৌগোলিক অবস্থান $25^{\circ}0'$ উত্তর থেকে $25^{\circ}15'$ উত্তর অক্ষাংশ এবং $88^{\circ}50'$ পূর্ব থেকে $89^{\circ}10'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত। গ্রামের মধ্যে প্রায় ০.১০ বর্গ

কিলোমিটার (১০ হেক্টর) অঞ্চল জুড়ে এই পুরাকীর্তিটি অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শনটির ভূমি পরিকল্পনা চতুর্ভুজ আকৃতির। এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত, প্লাইস্টোসিন যুগের বরেন্দ্র নামক অনুচ্চ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। মাটিতে লৌহজাত পদার্থের উপস্থিতির কারণে মাটি লালচে। অবশ্য বর্তমানে এ মাটি অধিকাংশ স্থানে পললের নিচে ঢাকা পড়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০.৩০ মিটার উচুতে অবস্থিত পাহাড় সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন একে 'গোপাল চিতার পাহাড়' আখ্যায়িত করত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর, যদিও এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।

৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে হিউয়েন ত্সাং পুন্ড্রবর্ধনে আসেন ও তার বিস্তারিত বিবরণে সোমপুরের বিহার ও মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৮১ - ৮২২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও রাজ্যকে বাংলা বিহার ছাড়িয়ে পাকিস্তানের উত্তর - পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সম্রাট ধর্মপাল অনেক নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন ও তিনিই বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য মতে, বিখ্যাত তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থ "পাগ সাম জোন কাং" এর

লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) কর্তৃক সোমপুরে নির্মিত বিশাল বিহার ও সুউচ্চ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। সোমপুর বিহারের ভিক্ষুরা নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থানে অর্থ ও ধন রত্ন দান করতেন বলে বিভিন্ন লিপিতে উল্লেখ করা আছে যা ১০ - ১১শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধশীল অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমপুর বিহার ছাড়াও অগ্রপুর (রাজশাহীর অগ্রাদিগুণ), উষ্মপুর, গোটপুর, এতপুর ও জগদল (রাজশাহীর জগদল) বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে গুর্জর রাজ প্রথম ভোজ ও মহেন্দ্র পাল, পাল সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করেন। পরে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে পাল বংশীয় রাজা মহীপাল (৯৯৫ - ১০৪৩) সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও সোমপুর বিহার মেরামত করেন। কিন্তু মহীপাল ও তার পুত্র নয়াপালের মৃত্যুর পর আবার পাল বংশের পতন শুরু হয়। এই সুযোগে মধ্যভারতের চেদীরাজ কর্ণ, চোলরাজ রাজেন্দ্র ও দিবেবা নামের এক দেশীয় কৈবর্ত সামন্ত নরপতি পর পর বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন। নালন্দায় পাহাড়পুর মন্দির ও বিহার ধ্বংসের উল্লেখ সম্ভবত এ সময়ের আক্রমণের। ১১শ শতাব্দীতে পাল বংশীয় রামপাল হতরাজ্য পুনরুদ্ধার

করেন। ১২শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজারা বাংলা দখল করেন। তাদের নিকটে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায় সোমপুর। এ সময় শেষবারের মত সোমপুরের পতন শুরু হয়। ১৩শ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ - বিন - বখতিয়ার খিলজী বাংলায় আক্রমণ করে প্রায় উত্তরবঙ্গই দখল করেন। সম্ভবত এই মুসলমান শাসকদের মূর্তিবিরোধী মনোভাবের ফলেই বৌদ্ধদের এই বিহার ও মন্দির সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বৌদ্ধ বিহারটির ভূমি-পরিকল্পনা চতুষ্কোনাকার। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় প্রতিটি ২৭৩.৭ মি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুদ্বয় ২৭৪.১৫ মি। এর চারদিক চওড়া সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সীমানা দেয়াল বরাবর অভ্যন্তর ভাগে সারিবদ্ধ ছোট ছোট কক্ষ ছিল। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অন্য তিন দিকের বাহুতে রয়েছে ৪৪টি করে কক্ষ। এই কক্ষগুলোর তিনটি মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি মেঝে বিছানো ইঁটের ওপর পুরু সুরকী দিয়ে অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। সর্বশেষ যুগে ৯২টি কক্ষে মেঝের ওপর বিভিন্ন আকারের বেদী নির্মাণ করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রথম যুগে সবগুলো কক্ষই ভিক্ষুদের আবাসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে কিছু কক্ষ প্রার্থনাকক্ষে রূপান্তর করা হয়েছিলো।

কক্ষগুলোর প্রতিটিতে দরজা আছে। এই দরজাগুলো ভেতরের দিকে প্রশস্ত কিন্তু বাইরের দিকে সরু হয়ে গেছে। কোন কোন কক্ষে কুলুঙ্গি পাওয়া যায়। কুলুঙ্গি সম্বলিত কক্ষগুলোর মেঝেতে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য বেশ কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ভেতরের দিকে কক্ষগুলোর দৈর্ঘ্য ৪.২৬ মি এবং প্রস্থ ৪.১১ মি। কক্ষের পেছনের দিকের দেয়াল অর্থাৎ সীমানা দেয়াল ৪.৮৭মি এবং সামনের দেয়াল ২.৪৪মি চওড়া। কক্ষগুলোর সামনে ২.৫মি প্রশস্ত টানা বারান্দা আছে। ভেতরের দিকের উন্মুক্ত চত্বরের সাথে প্রতিটি বাহু সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত।

বিহারের উত্তর বাহুর মাঝ বরাবর রয়েছে প্রধান ফটক। এর বাইরের ও ভেতরের দিকে একটি করে স্তম্ভ সম্বলিত হলঘর এবং পাশে ছোট ছোট কুঠুরি আছে। এই কুঠুরিগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। প্রধান ফটক এবং বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণের মাঝামাঝি অবস্থানে আরও একটি ছোট প্রবেশ পথ ছিলো। এখান থেকে ভেতরের উন্মুক্ত চত্বরে প্রবেশের জন্য যে সিঁড়ি ব্যবহৃত হত তা আজও বিদ্যমান। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুতেও অনুরূপ সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিলো। এদের মাঝে কেবল পশ্চিম বাহুর সিঁড়ির চিহ্ন আছে। উত্তর বাহুর প্রবেশ পথের সামনে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একটি পুকুর ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের খননে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রথম নির্মাণ যুগের পরবর্তী আমলে এ পুকুর খনন করা

হয় এবং এসময় এ অংশের সিঁড়িটি ধবংস করে দেয়া হয়।
পরবর্তীকালে পুকুরটি ভরাট করে দেয়া হয়।

পাহাড়পুর সংলগ্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত উল্লেখযোগ্য মূর্তি
বেলে পাথরের চামুন্ডা মূর্তি, লাল পাথরের দন্ডায়মান শীতলা
মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণুর খন্ডাংশ, কৃষ্ণ পাথরের দন্ডায়মান
গণেশ, বেলে পাথরের কীর্তি মূর্তি, দুবলহাটির মহারাণীর
তৈলচিত্র, হরগৌরীর ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের লক্ষ্মী
নারায়নের ভগ্ন মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের উমা মূর্তি, বেলে পাথরের
গৌরী মূর্তি, বেলে পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, নন্দী মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের
বিষ্ণু মূর্তি, সূর্য মূর্তি।



মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। পূর্বে এর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল।

এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর অবস্থান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১০ কি.মি উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন (১০৮২-১১২৫)

যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন এই গড় অরক্ষিত ছিল।

মহাস্থানের রাজা ছিলেন নল যার বিরোধ লেগে থাকত তার ভাই নীল এর সাথে।

এসময় ভারতের দাক্ষিণাত্যের শ্রীক্ষেত্র নামক স্থান থেকে এক অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ এখানে আসেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কারণ তিনি পরশু বা কুঠার দ্বারা মাতৃহত্যার দায়ে অভিশপ্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনিই এই দুই ভাইয়ের বিরোধের অবসান ঘটান

এবং রাজা হন। এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল রাম। ইতিহাসে তিনি পরশুরাম নামে পরিচিত। কথিত আছে পরশুরামের সাথে ফকির বেশী আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারী দরবেশ হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র:) এর যুদ্ধ হয়। (১২০৫-১২২০) যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন।

মহাস্থান গড় বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রাচীন পর্যটন কেন্দ্র। এখানে মাজার জিয়ারত করতে এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান হতে বহু লোক সমাগম ঘটে।



কান্তজীউ মন্দির

দিনাজপুর শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে কাহারোল থানার কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত কান্তজীউ মন্দির। অনেকের মতে কান্তনগরে স্থাপিত বলে-এর নাম কান্তজীউ মন্দির। জনশ্রুতি আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ অধিষ্ঠানের জন্য এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। দিনাজপুরের তৎকালীন জমিদার প্রাণনাথ রায় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ এ মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তবে তার জীবদ্দশায় এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। পরে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে তার ই পালক পুত্র রাম নাথ রায় মন্দিরের নির্মাণকাজ শেষ করেন।

স্থাপত্যিক রীতি, গঠন বিন্যাস, শিল্পচাতুর্য মন্দিরটির সামগ্রিক দৃশ্যকে এতই মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে যে এর চেয়ে সুন্দর, নয়নাভিরাম মন্দির

বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। শৈল্পিক বিশ্লেষণে প্রায় ৩ ফুট উঁচু এবং ৬০ ফুট বাহু বিশিষ্ট প্রস্থের নির্মিত বর্গাকৃতি সমান্তরাল জায়গার উপর এই মন্দির দণ্ডায়মান। সৌধ পরিকল্পনায় মন্দিরটি তিন ধাপে নির্মিত। সামগ্রিক দৃষ্টিতে মন্দিরটি দেখতে সুবৃহৎ রথের মতো। তিনতলা বিশিষ্ট এবং বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট এবং উচ্চতা ৭০ ফুট। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে কিছু অংশভেঙে যাওয়ায় উপরের গম্বুজ ঘরের আকৃতি ধারণ করেছে। ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়ার আগে গম্বুজের উপরে ৯টি সুদৃশ্য চুড়া ছিল।

মন্দিরের বেদির নিচে এবং দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি খচিত প্রায় লক্ষাধিক ছবি রয়েছে। পৌরনিক চিত্র সংবলিত টেরাকোটা ছাড়াও মন্দিরের দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূর্তির টেরাকোটা ও রয়েছে। কান্তজিউ মন্দিরের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায় এখানেবসে পঞ্চকালব্যাপী মেলা। দিনাজপুর কেন্দ্রীয় বাস স্টেশন থেকে পীরগঞ্জের বাসে কান্তনগর নামতে হবে। সেখানে

নেমে ঢেপা নদী পারহয়ে একটু সামনেই মন্দিরটি
। শীতের সময় নদী পায়ে হেঁটে পার হতে পারলে
ও বর্ষায় কিন্তু নৌকায় পার হতে হবে।



ষাট গম্বুজ মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটির গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। তাই এটি কে নির্মাণ করেছিলেন বা

কোন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিলো সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দেখলে এটি যে খান-ই-জাহান নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধারণা করা হয় তিনি ১৫শ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি বহু বছর ধরে ও বহু অর্থ খরচ করে নির্মাণ করা হয়েছিলো। পাথরগুলো আনা হয়েছিলো রাজমহল থেকে। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটির মধ্যে অবস্থিত; বাগেরহাট শহরটিকেই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়া

হয়েছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু।

সুলতান নসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আজম উলুগ খানজাহান সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন। খানজাহান বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল গড়ে তোলেন, যা পরে ষাট গম্বুজ মসজিদ হয়। তুঘলকি ও জৌনপুরী নির্মাণশৈলী এতে সুস্পষ্ট।

বহির্ভাগ

মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট আকারের খিলানযুক্ত দরজা আছে। মাঝের দরজাটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৭টি করে দরজা। মসজিদের ৪ কোণে ৪টি মিনার আছে। এগুলোর নকশা গোলাকার এবং এরা উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। এদের কার্গিশের কাছে বলয়াকার ব্যান্ড ও চুঁড়ায় গোলাকার গম্বুজ আছে।

মিনারগুলোর উচ্চতা, ছাদের কার্গিশের চেয়ে বেশি। সামনের দুটি মিনারে প্যাঁচানোসিঁড়ি আছে এবং এখান

থেকে আযান দেবার ব্যবস্থা ছিলো। এদের একটির

নাম *রওশন কোঠা*, অপরটির নাম *আন্ধার কোঠা*। মসজিদের

ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ বা পিলার আছে। এগুলো উত্তর থেকে

দক্ষিণে ৬ সারিতে অবস্থিত এবং প্রত্যেক সারিতে ১০টি করে

স্তম্ভ আছে। প্রতিটি স্তম্ভই পাথর কেটে বানানো, শুধু ৫টি স্তম্ভ

বাইরে থেকে ইট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। এই ৬০টি স্তম্ভ ও

চারপাশের দেয়ালের ওপর তৈরি করা হয়েছে গম্বুজ।

মসজিদটির নাম *ষাট গম্বুজ* (৬০ গম্বুজ) মসজিদ হলেও এখানে

গম্বুজ মোটেও ৬০টি নয়, গম্বুজ, ১১টি সারিতে মোট ৭৭টি। পূর্ব

দেয়ালের মাঝের দরজা ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝের মিহরাবের

মধ্যবর্তি সারিতে যে সাতটি গম্বুজ সেগুলো দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মত। বাকি ৭০টি গম্বুজ আধা গোলাকার।

অভ্যন্তরভাগ

মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মিহরাব আছে। মাঝের মিহরাবটি আকারে বড় এবং কারুকার্যমন্ডিত। এ মিহরাবের দক্ষিণে ৫টি ও উত্তরে ৪টি মিহরাব আছে। শুধু মাঝের মিহরাবের ঠিক পরের জায়গাটিতে উত্তর পাশে যেখানে ১টি মিহরাব থাকার কথা সেখানে আছে ১টি ছোট দরজা। কারো কারো মতে, খান-ই-জাহান এই মসজিদটিকে নামাযের কাজ ছাড়াও দরবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন, আর এই দরজাটি ছিলো দরবার ঘরের প্রবেশ পথ। আবার কেউ কেউ বলেন, মসজিদটি মাদ্রাসা হিসেবেও ব্যবহৃত হত।



মহাভূব

BCS, Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com